দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 14 JUL 1998 ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম 2 ...

দেশের চিকিৎসা শিক্ষার হাল-হকিকত

চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষাক্রমে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে ঐতিহ্যের অধিকারী। মূলতঃ এ দেশে সুপরিকল্পিতভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষাক্রমে প্রচলিত হয় ১৮৮৯ সালে ঢাকাস্থ মিটফোর্ড হাসপাতালের প্রতিষ্ঠার পর থেকে। কিন্তু তার বিস্তার ও বিকাশ সে প্রায় অর্ধশতাব্দীর বেশী সময় ধরে ব্যাহত থাকার পর ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকেই এদেশে চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিস্তার লাভ শুরু হলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অস্তিত্ব বাস্তবায়িত হয় এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে স্থাপিত হয় চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মেডিক্যাল স্কুল এবং আরও পরে সিলেট ও ময়মনসিংহ মেডিক্যাল স্কুল। তারও বেশ কয়েক বৎসর পরে চিকিৎসাবিজ্ঞানে দ্বৈত শিক্ষানীতি বাতিল করা হলে মেডিক্যাল স্কুলগুলোকে উন্নীত করা হয় মেডিক্যাল কলেজে এবং সে সঙ্গে ব্যবস্থা করা হয় সীমিত কিছু স্নাতকোত্তর পর্যায়ের প্রশিক্ষণের। তারপর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে পরেই সরকারী মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা অবিশ্বাস্যভাবে বাড়তে বাড়তে প্রায় প্রতি জেলায় একটি করে মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। আর সেই কার্যক্রমের সঙ্গে সমন্বয় রেখে পাশাপাশি অনেক বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ। অন্যদিকে, স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণের সংখ্যায় বর্ধিত হতে থাকে। ফলে, চিকিৎসাবিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগত দিক দিয়ে এদেশের গর্ব করবার যথেষ্ট কারণ থাকলেও আজ কিন্তু অনাবিষ্কৃত থেকে গেলে যে কারিগরিতে এদেশ কতখানি সাফল্য লাভ করেছে, বা চিকিৎসা বিজ্ঞানে কি দৃষ্টান্ত রাখতে সমর্থ হয়েছে।

এত অধিকসংখ্যক মেডিক্যাল কলেজের উপস্থিতিতে এদেশ নিঃসন্দেহে প্রতি বৎসর পর্যাপ্ত সংখ্যায় মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট তৈরী করতে সমর্থ। দুর্ভাগ্যবশত অদ্যাবধি এমন কোন তথ্যসম্বলিত গবেষণা বা পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি যার উপর ভিত্তি করে এদেশের মেডিক্যাল গ্রাজুয়েটদের প্রশিক্ষণের মান সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা সম্ভব। পক্ষান্তরে লোকমুখে যা প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত তাতে এদেশের মেডিক্যাল গ্রাজুয়েটদের শিক্ষাগত মান ক্রমশ নিম্নমুখী এবং তারা চিকিৎসা বিজ্ঞানে কোন অবদান রাখতে ব্যর্থ। প্রকাশিত কোন দলিলের অনুপস্থিতিতে অমন মন্তব্য বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য না হলেও দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি ও পরিবেশ তেমন মন্তব্যের সাক্ষ্য দিতে সমর্থ। বাস্তব দৃষ্টিতে দেখলে আমাদের দেশে উপযুক্ত শিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা, আরও বিশেষ করে ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহে, এত অপ্রতুল যে তাদের দিয়ে একাধিক মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষাদান শুধু অসম্ভব নয়; বরং রীতিমত অবাস্তব। সেখানে প্রায় প্রতিটি জেলায় রয়েছে মেডিক্যাল কলেজ এবং তেমনি সংখ্যাধিক বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ।

পৃথিবীর আর অন্যান্য দেশের তুলনায় চিকিৎসাবিষয়ক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা শুধু ভিন্নতরই নয়, বরং বিপরীতমুখী। ফলে, মেডিক্যাল কলেজসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হলেও শুধু ওই নিজ সীলমোহরে সনদপত্র বিতরণ ছাড়া তার কোন কার্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যূনতম কোন ক্ষমতা বা অধিকার পর্যন্ত নেই।

বাংলাদেশের মেডিক্যাল কলেজসমূহ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের মত শুধু স্নাতক-পূর্ব শিক্ষাক্রমে সীমিত। ফলে, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর কোন পরিবেশের অবর্তমানে সেখানকার প্রশিক্ষণের মানও উন্নত হতে পারেনি। এর ওপর অভিজ্ঞতার আলোকে যা প্রতীয়মান তাতে প্রতিটি সরকারী মেডিক্যাল কলেজে সুনির্দিষ্ট কোন শিক্ষাক্রম অনুষ্ঠিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, কোন মেডিক্যাল কলেজে কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যবইয়ের উর্ধ্বেও রেফারেন্স হিসেবে আরও কিছু বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেও অন্য একটি মেডিক্যাল কলেজে সেই একই বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন পাঠ্য বই পাঠের তোয়াক্কা কেউ করে না কেননা, নোটবই বা "মেড ইজি" জাতীয় বইপত্র সেখানে ছাত্র-ছাত্রীকে দিতে পারে পরীক্ষা পাসের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। আর এ সমস্তের সমন্বয়ে শিক্ষাক্রমের যে পরিবেশ তা নিঃসন্দেহে শিক্ষাগত মানে যে কোন ধরনের অবক্ষয় আনতে সমর্থ।

পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা

বাংলাদেশে ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রম ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে এবং কোন বিশেষ বিষয়ে

এদেশ নিঃসন্দেহে প্রতি বৎসর পর্যাপ্ত সংখ্যায় মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট তৈরী করতে সমর্থ। দুর্ভাগ্যবশত অদ্যাবধি এমন কোন তথ্যসম্বলিত গবেষণা বা পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি যার উপর ভিত্তি করে এদেশের মেডিক্যাল গ্রাজুয়েটদের প্রশিক্ষণের মান সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা সম্ভব। পক্ষান্তরে লোকমুখে যা প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত তাতে এদেশের মেডিক্যাল গ্রাজুয়েটদের শিক্ষাগত মান ক্রমশ নিম্নমুখী এবং তারা চিকিৎসা বিজ্ঞানে কোন অবদান রাখতে ব্যর্থ। প্রকাশিত কোন দলিলের অনুপস্থিতিতে এমন মন্তব্য বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য না হলেও দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি ও পরিবেশ তেমন মন্তব্যের সাক্ষ্য দিতে সমর্থ। বাস্তব দৃষ্টিতে দেখলে আমাদের দেশে উপযুক্ত শিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা, আরও বিশেষ করে ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহে, এত অপ্রতুল যে তাদের দিয়ে একাধিক মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষাদান শুধু অসম্ভব নয়; বরং রীতিমত অবাস্তব। সেখানে প্রায় প্রতিটি জেলায় রয়েছে মেডিক্যাল কলেজ এবং তেমনি সংখ্যাধিক বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ।

প্রশিক্ষণ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে, পরিসংখ্যান দিক দিয়ে দেশীয় তৈরী বিশেষজ্ঞের সংখ্যা অত্যন্ত সন্তুষ্টজনক হলেও, কিছু ক্ষেত্রে তাদের মান নিরূপণ এবং সেই বিশেষ প্রশিক্ষণের বাস্তবতা নির্ধারণ করা অসম্ভব। বরং পরিস্থিতির বিশ্লেষণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সীলযুক্ত কাগজের ভূষণ বলে প্রতীয়মান হতে পারে। প্রশাসনিক ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থার ফলে সত্যিকারের প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত হতে পারে না। প্রথমতঃ তেমন সুযোগ শুধু ঢাকার মধ্যেই সীমিত। ফলে, কোন বিশেষ বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভে কারও সদিচ্ছা বা আন্তরিকতা থাকলেও, ঢাকার বাইরে তেমন সুযোগের অবর্তমানে তারা তেমন সুযোগ লাভে বঞ্চিত। অন্যদিকে, প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজে স্নাতকোত্তর কার্যক্রমের অবর্তমানে একদিকে সেখানকার মান উন্নয়ন করতে ব্যর্থ, তেমনি ব্যর্থ সত্যিকারের কোন নিবেদিত চিকিৎসককে তেমন কোন প্রশিক্ষণ দান। সর্বোপরি এ সমস্ত স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রম মূলতঃ এবং মুখ্যতঃ সরকারী চাকুরেদের জন্য উন্মুক্ত। ফলে, বাস্তব ক্ষেত্রে সরকারী চাকুরী যারা করেন না, তারা সেই বিষয়ে যত নিবেদিতপ্রাণ হোন না কেন, তাদের জন্য তেমন কোন সুযোগ লাভ প্রায় অসম্ভব। ফলে, কোন বিষয়ে সত্যিকারের উৎসাহী চিকিৎসক তাই বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণে ব্যর্থ। এ সমস্ত সুযোগ-সুবিধা শুধু তারাই লাভ করেন যারা নিজেদেরকে ঢাকা শহরে রেখে নিজেদেরকে নির্বাচিত করে সরকারী ব্যয়ে তেমন প্রশিক্ষণ লাভ করে থাকেন। এমন শিক্ষা ব্যবস্থা মূলতঃ ত্রুটিপূর্ণ এবং কে কোন এক বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ লাভে ইচ্ছুক তা স্থির করা অসম্ভব এবং এই সদিচ্ছাই বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণের সত্যিকারের পূর্বশর্ত। স্নাতক-পূর্ব শিক্ষাক্রমের মত যদি প্রার্থীকে নিজ অর্থ ব্যয়ে বা কোন স্কলারশীপ লাভে স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণ লাভের ব্যবস্থা এই দেশে প্রচলিত থাকতো তবে সেই সুযোগ শুধু সেই সমস্ত মেডিক্যাল গ্রাজুয়েটরা করতেন যারা নিজেদের সেই বিশেষ বিষয়ে উৎসর্গীকৃত করতে আত্মনিবেদিত। কিন্তু তেমন কোন বিধান নেই, কোন বিশেষ বিষয়ে কেউ সত্যিকারের আগ্রহী হোন বা না হোন, নেহাৎ সরকারী খরচে রাজধানী শহরে বাস করে নামের শেষে লেজুড় জুড়ে নেবার তেমন সুযোগের অনেকে সদ্ব্যবহার করে থাকেন। অন্যদিকে, কোন বিষয়ে সত্যিকারের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে সেই বিষয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বিশেষ শিক্ষাদান যে কতখানি বাস্তব ও উপযোগী তা ভেবে দেখা দরকার। আমার ব্যক্তিগত জানা মতে নিপসমের কোন একটি বিশেষজ্ঞের শিক্ষাক্রমে নিয়োজিত শিক্ষকদের কারও সেই বিষয়ে কোন বিশেষ প্রশিক্ষণ না থাকা সত্ত্বেও সেই কোর্স দিব্যি চালু ছিল। অন্য একটি উদাহরণে দেখা যায় সাধারণ কেউ মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট শিক্ষকের পরিচালনায় বিশেষজ্ঞের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স। ফলে, সেই সমস্ত শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থী কতখানি সুষ্ঠুভাবে এবং কোন মানে প্রশিক্ষণ লাভ করে থাকেন, সে প্রশ্ন বিরাট এক প্রশ্নবোধক চিহ্নের সঙ্গে উচ্চারিত হলেও বাস্তব যে সেই সমস্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকরা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা দ্বারা ভূষিত হয়ে থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপ্রাপ্ত এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দ্বারা স্বীকৃত বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা বাড়াবার জন্য দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী ডক্টর অব মেডিসিন (এমডি) এবং মাষ্টার অব সার্জারী (এমএস)। সম্ভবত ক্ষমতা ও অধিকারের অবর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় নীরব থাকলেও প্রশ্ন উঠে, সেই সমস্ত শিক্ষাক্রমের শিক্ষক কে হবেন, কে দেবেন তেমন উচ্চতর প্রশিক্ষণ? বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু শিক্ষানীতির প্রেক্ষিতে এবং আদর্শ শিক্ষাদানের স্বার্থে একজন মাষ্টার ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষক মাষ্টার্স শিক্ষাক্রমে শিক্ষকতায় সমর্থ হলেও ব্যাচেলার ডিগ্রীধারী কেউ মাষ্টার্স শিক্ষাক্রমে তো অনেক দূরের কথা ব্যাচেলার্স শিক্ষাক্রমেও তাদেরকে শিক্ষকতার কোন দায়িত্ব দেয়া হয় না। এমনকি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতেও উচ্চতর স্নাতকোত্তর কোন ডিগ্রী ব্যতিরেকে কোন চিকিৎসক শিক্ষকতার পদ লাভ করতে পারেন। অথচ এদেশে তেমন কোন আইনানুগ বিধান থাকায় এদেশে সমস্ত মেডিক্যাল গ্রাজুয়েটই শিক্ষক হবার যোগ্য, আর সেখানে দেশীয় বা বিদেশী পেশাগত কোন সংস্থার সদস্যপদ থাকলে তো কোন কথাই নেই। আর সেই সমস্ত শিক্ষকই এদেশে উচ্চতর ডিগ্রী এমডি ও এমএস-এর শিক্ষাক্রমে নিয়োজিত এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত। ফলে তেমন প্রশিক্ষণ কতখানি সমৃদ্ধ, কতখানি উন্নত, চিকিৎসাবিজ্ঞানে কতখানি উপযোগী, তা শুধু কল্পনাবিদদের কল্পনাযোগ্য। তবে বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে তেমন প্রশিক্ষণ সম্ভবত প্রহসন হিসেবে অভিহত করা যেতে পারে।

❑ ডাঃ তাসাদ্দুক হোসেন